Journal of Rajshahi College, **Vol. 1, Nos. 1 & 2, 2023, pp. 213-226**

মধ্যযুগে বাংলার ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উত্থান-পতন : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

আসিফ জামাল লস্কর*

Abstract

The word 'Bhati' started to be used in the medieval period. At first, Muslim historians used this term, and later this word gradually became popular in history. Bhati indicates a coastal area from Chittagong to Hooghly basin near Hijli Port. Richard M. Eaton says, "Bhati was its far greater agricultural productivity and population growth relative to contemporary West Bengal. Ultimately, this arose from the long-term eastward movement of Bengal's river system, which deposited the rich silt that made the cultivation of wet rice." The economy of medieval Bengal depended on these regions because the sea rout was the prime communication in this period. Trade and commerce were deeply attached to these Bhati areas. In ancient times, most part of these areas were covered with jungles. However, in medieval age, it became the main character in the economic and political history of medieval Bengal. The paper explains the subject minutely, using contemporary sources, especially the vernecular literatures.

Keywords: *ভাটি; ব্যবসা-বাণিজ্য; জঙ্গল; উপকূল অঞ্চল; অথনীতি; সমুদ্রপথ*

নদীমাতৃক সভ্যতার সূত্র ধরে সুপ্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল বহু বর্ধিষ্ণু জনপদ। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের নগরায়ণের সার্থক বাস্তবায়নের কারণ এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান। এই অঞ্চলের অসংখ্য নদনদী কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ অনুকূল। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে দক্ষিণ বঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবহমানতা আলোচনার দাবিদার। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মধ্যযুগের ভাটি অঞ্চলের শহরগুলি ও এদের অর্থনৈতিক প্রবহমানতাকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করা।

গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল অধুনা বিস্মৃত নগরীমালার রহস্যময় সমাধি ভূমি। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতব্দীতে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, মুকুন্দরামের চন্ডী মঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে এই অঞ্চলের জনপদ ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া পীর গোরাচাঁদের গীত, কালু গাজী

* ড. আসিফ জামাল লস্কর, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, মৌলানা আজাদ সরকারি কলেজ, কলকাতা ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ই-মেইল: ashifzamal17@gmail.com

♦ **Article** received 25 January, 2023 & rccepted 22 June, 2023.

To cite this article: লস্কর, আসিফ জামাল (২০২৩)। মধ্যযুগে বাংলার ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উত্থান-পতন: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। *Journal of Rajshahi College,* 1(1 & 2), 213-226.

ও বরখান গাজীর গীত ও আলাপচারিতা ও বাসুকি-কূলকথা নামক বাংলা পুথিতে এ অঞ্চলের নানা তথ্য বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া জ্যোয়াও দ্য ব্যারেস, ভ্যান ডান ব্রুক ও সসনের মানচিত্রে বিভিন্ন নদীর প্রবহমানতা ও নগর-বন্দরগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক বাংলায় আগত সিজার ফ্রেডারিক, মানরিখ, বার্নিয়ার, ত্যাভারনিয়ার, র‍্যালফ ফিচ্ ও বারবোসা প্রমূখ বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবহমানতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ক.

বাংলার ভাটি অঞ্চল বলতে দক্ষিণ গাঙ্গেয় (পদ্মা ও ভাগিরথীর) বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত ফরিদপুর থেকে আরম্ভ করে ভাগীরথীর তীরে, ডায়মন্ড হারবারের সাগরসংগম[১] পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, শ্রীপুর, যশোর, খুলনা এবং চব্বিশ-পরগণার হিজলী পর্যন্ত নিম্নভূমিকে নির্দেশ করে। ঐতিহাসিক কাল থেকেই এই অঞ্চল কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য, অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি; কখনওবা নদীগর্ভে বিলীন। আবার কখনও খাড়ি-খড়িকা অন্তর্নিহিত হয়ে নতুন স্থলভূমির সৃষ্টি করেছে। আইন-ই-আকবরি ও বাহারিস্তান-ই-গায়বিতে প্রদত্ত যুদ্ধ বিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণের ভিত্তিতে ভাটি অঞ্চল হলো পশ্চিমে হাতিয়াগড়, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা) নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচং।[২] তিনটি বড় নদী গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা ও তাদের শাখা-প্রশাখা বিধৌত ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেট বেষ্টিত নিম্নাঞ্চল হলো ভাটি অঞ্চল। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আবুল ফজল ভাটির আয়তন সম্পর্কে বলেন, সুবাহ বাংলার চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে মান্দারণ (হুগলি জেলা) পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত।[৩]

আবুল ফজল এবং মির্জা নাথান মোগল ও বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থে ভাটির পরিচয় পাওয়া যায়। আবুল ফজল আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরিতে ভাটির যে সংজ্ঞা প্রদান করেন তা অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। আকবরনামায় বর্ণিত ভাটি পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মধ্যে সুন্দরবন ও মেঘনা নদী অন্তর্ভুক্ত। আবুল ফজল বলেছেন যে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনী 'কিয়ারা সুন্দর' অতিক্রম করে 'কস্ত্তল' এর নিকটে ঈসা খানকে পরাজিত করে।[৪] 'কিয়ারা সুন্দর' এর বর্তমান নাম এগারসিন্ধুর। এটি কিশোরগঞ্জ জেলার

---

[১] ডায়মন্ড হারবারের সাগর সঙ্গম বলতে হাতিয়াগড় পরগণার সুন্দরবন থেকে সাগর দ্বীপ (হিজলী) পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে।

[২] Bhatti as mentioned by Abul Fazl and Mirza Nathan: *N. K. Bhattasali Commemoration Volume*, (Dhaka: 1966), p. 311-322.

[৩] Abul Fazl Allami, *The Ain-i-Akbari*, (tr. H. Blochmann), (New Delhi: 1965), 2nd ed., pp. 132-136.

[৪] *Ibid*., p. 136.

পাকুন্দিয়া উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্থান 'কস্ত্তল' (সম্ভবত বর্তমান নাম কাসতাইল) একই জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে তান্ডায় আসেন এবং সেখান থেকে শ্রীপুর, বিক্রমপুর, এবং সোনারগাঁও অঞ্চল ভ্রমণ করেন।[৫] তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তিনি ভাটি এলাকার প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ভাটি নদী-নালা বেষ্টিত হওয়ায় বারো ভূঁইয়ারা অনেক দিন ধরে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। জেম্‌স গ্র্যান্ট হিজলী, যশোহর এবং বাকেরগঞ্জকে ভাটির অন্তর্ভুক্ত করেন।[৬] হেনরী ব্লকম্যান হুগলি থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে ভাটি হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৭] তাসত্ত্বেও ব্রিটিশ আমলা ও কিছু ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের কারণে ভাটির শনাক্তকরণ নিয়ে বতর্মানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম খান চিশ্‌তি ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পর রাজমহলে আসেন এবং বারো ভূঁইয়াদের দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন মির্জা নাথান। মির্জা নাথানের বাহারিস্তান-ই-গায়বিতে ভাটির উল্লেখ আরও স্পষ্ট। নাথান প্রথমেই বলেন যে, ইসলাম খান চিশ্‌তি প্রধানত ভাটি আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই রাজমহল ত্যাগ করেন।[৮] কিন্তু মুসা খান ঢাকার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত যাত্রাপুরে সর্বপ্রথম মোগলদের বাধা দেন। যাত্রাপুর চাঁদ প্রতাপ পরগণায় অবস্থিত। পরগণাটি বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী নদীর উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিলো। অর্থাৎ মুসা খানের যাত্রাপুর বারো ভূঁইয়াদের নিয়ন্ত্রিত সীমানার মধ্যে অবস্থিত। তাই ভাটির পশ্চিম সীমা হল যাত্রাপুর বা চাঁদ প্রতাপ পরগণা বা ইছামতি নদী। মির্জা নাথান ও র‍্যাল্‌ফ ফিচের প্রদেয় বর্ণনা অনুযায়ী ভাটির দক্ষিণ সীমা গঙ্গা (পদ্মা) নদী।

আইন-ই-আকবরিতে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাটির পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য। কিন্তু ভাটির উত্তর সীমা নির্ধারণ করার মতো নির্দিষ্টভাবে কোনো তথ্য আবুল ফজল বা মির্জা নাথানের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে আকবরনামায় ঈসা খানের যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা অনুযায়ী আলপসিংহ পরগণা (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা) ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে মনে হয়। ভাটির উত্তর-পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করার সহায়ক একটি বক্তব্য বাহারিস্তান-ই-গায়বিতে পাওয়া যায়। এতে বলা হয়, বানিয়াচংয়ের জমিদার আনোয়ার খান (বা আনোয়ার গাজি) ঢাকায় মোগলদের

---

[৫] Ralph Fitch, *The Voyage of Master Ralph Fitch Marchent of London to Ormus and go to Goa in the East India to Cambodia, Ganges, Bengala...., Purchas his Pilgrimes by Samuel Purchas*, Vol. X, 1905, p.185.

[৬] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, (London: Trubner, 1876), pp. 220-226.

[৭] H. Blockmann, "Contribution to the Geography and History of Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (hereafter JASB), Vol. XLIV(I), (Calcutta: 1875), p. 28-32.

[৮] Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, tr. M.I. Borah, Vol. 1, (Assam: Government of Assam, 1936), p. 249-260.

নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[৯] মির্জা নাথান আনোয়ার খানকে মুসা খানের মিত্র জমিদার বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বানিয়াচং (বৃহত্তর সিলেট) ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ভাটির উত্তর-পূর্ব সীমা বানিয়াচং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

ভাটি বাংলার নিম্নাঞ্চল, নদী-নালায় পরিপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমের বেশির ভাগ সময় এই অঞ্চল জলমগ্ন থাকে। জলমগ্নতার কারণে আকবরের সৈন্যবাহিনী বার বার ভাটির জমিদারদের নিকট পর্যুদস্ত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম খান তাঁর সর্বশক্তি ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। তিনি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন এবং ভাটির জমিদারদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে, তারা আর বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি। বিশিষ্ট গবেষক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে, গৌড়ের পতনের পর থেকে ঢাকার উত্থান পযর্ন্ত সময় কালে রাঢ়-বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ভাটি অঞ্চলের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।[১০]

খ.

প্রাচীন কাল থেকেই পদ্মা-ভাগীরথীর বিভিন্ন প্রবাহপথের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস অনুসরণ করলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূ-ভাগে, অর্থাৎ নদী দুটির অসংখ্য খাড়ি অঞ্চলে কি বিপ্লবই না চলেছে যুগের পর যুগ। এই দুইটি নদী এবং তাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা-বাহিত সুবিপুল পলিমাটি পদ্মা-ভাগীরথী মধ্যবর্তী খাড়িময় ভূ-ভাগকে তছনছ করে বারবার তার রূপ পরিবর্তন করেছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে ভাগীরথীর তীরে ডায়মন্ড হারবারের সাগরসংগম পর্যন্ত বাখরগঞ্জ, শ্রীপুর, যশোর, খুলনা, চব্বিশ-পরগণার নিম্ন-ভূমি ঐতিহাসিক কাল থেকেই এক বৈপ্লবিক উত্থানের পটভূমি।

মধ্যযুগে ভাটি অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র

সন্দ্বীপ

সন্দ্বীপের লবণ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ কারখানা এবং বস্ত্র শিল্প পৃথিবীখ্যাত ছিলো। উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভ্রমণকারীরা এই অঞ্চলে এসে তাদের জাহাজ নোঙর করতো ও সহজ বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং পরিবহন সুবিধা থাকায় এই অঞ্চলে ব্যবসা ও বসতি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করতো।[১১] সন্দ্বীপ এক কালে কম খরচে মজবুত এবং সুন্দর জাহাজ নির্মাণের জন্য পৃথিবীখ্যাত ছিলো। ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় এই জাহাজ রপ্তানি করা হতো। তুরস্কের সুলতান এই এলাকার জাহাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এখান

---

[৯] *Ibid*., pp. 249-260.

[১০] অনিরুদ্ধ রায়, "ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে নগর বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন", *আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ২২০-২৪২।

[১১] চট্টগ্রামের উপকূলে অবস্থানের কারণে এবং রণকৌশলগত সুবিধার জন্য মোগল শাসক ও আরাকানের মগদের লোলুপ দৃষ্টি ছিলো সন্দ্বীপের উপর। তাই রণকৌশল গত কারণে সন্দ্বীপকে দখলে রাখা বিভিন্ন আগ্রাসী শক্তি সমূহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো। Jadunath Sarkar, "The conquest of Chatgaon, 1666 A. D.", *JASB*, Numismatic Supplement -3, Vol. VI, (Calcutta: 1907), p. 406.

থেকে বেশ কিছু জাহাজ ক্রয় করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে সন্দ্বীপ ছিলো একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর। লবণ এবং জাহাজ ব্যবসা, শস্য সম্পদ ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগিজরা সন্দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাছাড়া ভ্রমণ এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ফরাসি ও ওলন্দাজ পরিব্রাজকরা প্রায়শই সন্দ্বীপে আসতো। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর সন্দ্বীপে উৎপাদিত প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ লবণ, তিনশ জাহাজে করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো।[১২]

আরব বণিকরা সপ্তম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ বঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করে ধর্মের প্রসার ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এই পর্বে সন্দ্বীপ একটি খ্যাতনামা বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র। আরব বণিকরা চট্টগ্রাম থেকে কাঠ এনে সন্দ্বীপের দক্ষ কারিগরদের দ্বারা নৌকা ও জাহাজ তৈরি করতেন। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক-পর্যটক ইবনে বতুতা সন্দ্বীপে আসেন।[১৩] ভেনিশীয় পর্যটক সিজার ফ্রেডরিকও সন্দ্বীপে এসেছিলেন। তিনি সন্দ্বীপকে পৃথিবীর উর্বরতম দ্বীপ হিসেবে উল্লেখ করেন।[১৪]

শ্রীপুর

শ্রীপুর বর্তমানে পদ্মার গর্ভে বিলীন একটি শহর। মুন্সিগঞ্জ জেলায় পদ্মার তীরে অবস্থিত শ্রীপুর ছিলো চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের রাজধানী। র‍্যাল্‌ফ ফিচের মতে, সোনারগাঁও থেকে ছয় লিগ দক্ষিণে ছিলো এর অবস্থান। ডি বারোস, ব্লেভ এবং ভ্যান ডেন ব্রুক শ্রীপুরের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ব্যক্ত করলেও সোনারগাঁও থেকে দক্ষিণে যে এর অবস্থান ছিলো সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত। তাঁরা শ্রীপুরকে একটি বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করেন। পর্তুগিজ নাবিকগণ প্রায়শই এখানে তাদের জাহাজ মেরামত করাতে আসতেন বলে শহরটিতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। ভ্যান ডেন ব্রুক একে 'শেরপুর ফিরিঙ্গি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্তুগিজ বসতি ছিলো। র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ শ্রীপুরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি আলবার্তো কার্ভালোর একটি পর্তুগিজ জাহাজে চড়ে শ্রীপুর থেকে পেগু যান।[১৫]

---

[১২] H. Beveridge, *The History of Bakhergang: It's History and Statistics*, (London: Trubner, 1876), p. 35.

[১৩] Ibn Battuta, *The Rehala*, (Aga Mehdi Hussain tr. & ed.), (Baroda: Oriental Press, 1953), p. 233-242.

[১৪] Ceasar Fredericke, *Extracts of Master Ceasar Fredericke his Eighteen Years Indian Observation, in Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes*, by Samuel Purchas, Vol. X, (Glasgow: James Maclehose and Sons, 1905), p.182.

[১৫] Ralph Fitch, *op.cit*., p. 176-185.

বাকলা বা বাখরগঞ্জ

মধ্য যুগে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্যতম ভাটি শহর হল বাকলা বা বাখরগঞ্জ। সোনারগাঁয়ের দনুজ রায় মুসলিম বিজয়ীদের দ্বারা বিতাড়িত হবার পর চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও পরিচিত। বাকলা এর লোকায়ত নাম এবং চন্দ্রদ্বীপ ছিলো রাজনৈতিক নাম। ব্লকম্যানের মতে চন্দ্রদ্বীপ-বাকলা ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ছিলো। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এই অঞ্চলটি সর্বপ্রথম মুসলিম অধিকারে নিয়ে আসেন। দাউদ কররানির মৃত্যুর পর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাকলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৭]

আবুল ফজল বলেছেন, বাকলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আছে। র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ বাকলার সুন্দর বাড়িঘরের কথা বলেছেন এবং এর সুবৃহৎ রাস্তাগুলির প্রশংসা করেছেন। আবুল ফজল বাকলা রাজ্যের বর্ণনায় বলেছেন যে, সরকার বাকলা সমুদ্র তীরবর্তী স্থান। এখানে বৃক্ষলতা বেষ্টিত একটি দুর্গ আছে। নদী ও সমুদ্র ঘেরা এই অঞ্চলে বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশে আসত।[১৮] র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ বলেছেন যে, বাকলায় প্রচুর সূতি ও রেশম কাপড় পাওয়া যায়। এখানকার মহিলারা গহনা ও হাতির দাঁতের আঙটি ব্যবহার করে। নৌকা নির্মাণে বাকলা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বাকলার দেবাইখালি ও শ্যামপুরে উৎকৃষ্ট মানের কোষা নৌকা তৈরি হতো। এছাড়া আগরপুরের নিকট ঘন্টেশ্বর ও বর্ষাকাঠিতে ভালো পানসি নৌকা তৈরি হতো।[১৯] প্রবল জলোচ্ছাস এবং নদীর প্লাবনে মধ্যযুগের বাকলা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অধিকাংশ পণ্ডিত বাকলা নামক প্রাচীন স্থানটি মেঘনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে মনে করেন।[২০]

সুন্দরবন

সুন্দরবনের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে ওয়েস্টল্যান্ড লিখেছেন, "I suppose no one will hesitate to acknowledge that the whole country, including the sundarbans proper, lying between Hooghly on the West and Meghna in the east, is only the Delta caused by deposition of the debris carried down by the rivers Ganges and Brahmaputra and their tributaries."[২১] সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান

---

[১৬] Syed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1987), p.19.

[১৭] মোঃ আসিফ জামাল লসকর, *সুলতানি যুগে বাংলার নগরায়ন*, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ. ৯১।

[১৮] Abul Fazl, *op.cit.*, p. 136.

[১৯] এ.এফ.এম. আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬), পৃ. ৬১৯।

[২০] আবুল কালাম আজাদ, বাকেরগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্যিক ঐতিহ্য, অপ্রকাশিত এম.ফিল. সন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১৩-২৩।

[২১] J. Westland, *District of Jessore: Its History, Antiquity and its Commerce*, (Calcutta: 1871), p. 2-23.

সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশ পরগণা-খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্ন-ভূমিতে। আর এই সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। কারণ এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার নিম্নাঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমৃদ্ধ-ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। খুলনার দিকে এবং বাখরগঞ্জের কিয়দংশে তো এখনও গভীর অরণ্য।[২২]

আকবরের আমলে ঈশা খাঁ ভাটি অঞ্চলের সামন্তপ্রভু ছিলেন। সেই সময়ে মাহমুদাবাদ ও খলিফাতাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিলো বর্তমান ফরিদপুর, যশোর এবং নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ। এসময়ে এই দুই সরকারের অন্তর্গত বহুলাংশ গভীর অরণ্যময় ছিলো। খান জাহান আলীর আমলে (ষোড়শ শতব্দীতে) যশোর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিলো। অবশ্য ঈশা খাঁ সুন্দরবনের অনেক অংশ নতুনভাবে আবাদযোগ্য করে তুলেছিলেন।[২৩] ইউসুফ শাহ, সৈয়দ হোসেন শাহ, নুসরৎ শাহ প্রমুখ সুলতানেরা এইসব অরণ্যে নতুন আবাদ করেছিলেন, প্রধানত ফরিদপুর ও যশোরে অঞ্চলে। এই দুই জেলার অনেক অংশ তখন ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিলো। ষোড়শ শতব্দীতে ফতেহাবাদের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু' কাব্যে। তিনি বলেছেন-

নগর ফতেহাবাদ দেখিয়া পুরহ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস।।
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
শুভ পুরী অতি দিব্যধাম।
চৌ দিকে পরবত গড় অধিক উজ্জ্বলতর
তাত শাহ বদর আলম।।[২৪]

জেসুইট পাদ্রি ফার্নান্দিজ হুগলি থেকে শ্রীপুর হয়ে চট্টগ্রামের সমস্ত পথটাই ব্যাঘ্রসঙ্কুল বলে বর্ণনা করেছেন।[২৫] এক বৎসর পর ফনসেকা (১৫৯৯) বাকলা থেকে চ্যান্ডিকানের (Chandeecan) মধ্যবর্তী পথ বানর ও হরিণ-আধ্যুষিত বনময় ভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। র‍্যালফ ফিচ বলেছেন, বাকলা বন্দরের সন্নিকটে রয়েছে ঘন জঙ্গল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রতাপাদিত্য যশোরের সুন্দরবন অঞ্চলেই নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[২২] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯১৪), পৃ. ৪৭০-৪৮২।

[২৩] মনোরঞ্জন বিশ্বাস, *বাগেরহাট সন্দর্ভ*, (বাগেরহাট: কল্পনা বিশ্বাস, ১৯৯৮), পৃ. ২।

[২৪] দৌলত উজির বাহরাম খা, *লাইলী-মজনু*, আহমদ শরীফ (সম্পা.), (ঢাকা: ১৯৫৭), পৃ. ১০৩।

[২৫] নিকোলাই পাইমন্তাকে লেখা পাদ্রি ফারনান্দেজ এর চিঠি, শ্রীপুর, ১৫ই জানুয়ারি, ১৫৯৯; উদ্ধৃত, সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯২২), পৃ. ৭০০-৭০৫।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি দেশের বনজ সম্পদের একটি বৃহত্তম উৎস। এই বনজ সম্পদ কাঠের উপর নির্ভরশীল শিল্পে কাঁচামাল জোগান দেয়। কাঠ, জ্বালানী ও মন্ডের মত প্রথাগত বনজ সম্পদের পাশাপাশি এই বন থেকে নিয়মিত ব্যাপকভাবে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার পাতা, মধু, মৌচাকের মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। এই প্রাকৃতিক সম্পদ নদী পথে বাংলার সর্বত্র ও বিদেশে রপ্তানি করা হতো।[২৬]

যশোর-খুলনা-ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের কিছু কিছু নিম্ন-ভূমি হিন্দু আমল থেকেই ধীরে ধীরে ক্রমশ সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং এই ধারা সুলতানি যুগেও বহমান ছিলো। কিন্তু প্রকৃতির তাণ্ডব এবং মানুষের ধ্বংসলীলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতব্দীতেই এর উপর যবনিকা টেনে দেয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং বাংলাদেশের খুলনা-বাখরগঞ্জের নিম্ন-ভূমি অঞ্চল নিয়ে সুন্দরী গাছের সুন্দরবন এলাকা। মধ্যযুগে এই এলাকার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। জনবসতিপূর্ণ এলাকা হয়ে যায় জনশূন্য। এর কারণ, একদিকে যেমন ছিলো প্রকৃতির তাণ্ডব এবং অন্যদিকে ছিলো মগ ও পর্তুগিজদের লাগাতার লুঠপাট ও হত্যা। এর ফলে এক সময়ের জনবসতি এলাকা সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেল জনশূন্য।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেহাবাদ এলাকায় প্রবল বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে এই এলাকার মানুষের ঘরবাড়ি, নৌকোসহ জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এই বন্যায় প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।[২৭] এরপর শুরু হয় মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের ঘন ঘন লুটপাট এবং খুন-জখম। তাই ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের জেম্‌স রেনেলের মানচিত্রে বাখরগঞ্জ এলাকাকে বলা হয়েছে "মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনমানবহীন অঞ্চল (Country depopulated by the Maghs)।"[২৮] এই জঙ্গল এলাকা বাদ দিয়ে যে বিস্তীর্ণ জনবসতি এলাকা ছিলো সেটি ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে গেল। এভাবেই মধ্যযুগে অনন্য সুন্দরী সুন্দরবনের অরণ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক পরিবর্তনের ইতিহাস।

হিজলী

সুবর্ণরেখা নদী যেখানে সাগরে পতিত হয়েছে ঠিক তারই সন্নিকটে গড়ে উঠেছিল হিজলী বন্দর। চট্টগ্রাম সন্নিহিত এলাকা থেকে জনগণকে দাস হিসেবে বন্দি করে হিজলীতে আনা

---

[২৬] সুন্দরবনের ভাটি অঞ্চলের নাব্য নদীপথে হবিগঞ্জের মধ্য দিয়ে ঢাকা যাওয়া যেতো। এ ছাড়া লখিপুর, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, বাকলা, যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের নাব্য নদীপথে প্রধানত লবণ, কাঠ ও কাপড়ের ব্যবসা ধারাবাহিক ভাবে চলেছিল সমগ্র মধ্য যুগ ধরে। সূত্রঃ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস* (অষ্টাদশ শতাব্দী), (কলকাতাঃ কে. পি. বাগচী আন্ড কোম্পানি, ২০০১), পৃ. ১৭৬-১৭৭।

[২৭] C. R. Wilson, "Note on the Topography of the river in the 16th century from Hughli to the area as represented in the ' Da Asia' of J. Barros ", *JASB*, Vol. I, 1892, p. 110-111.

[২৮] James Rennell, *Memoirs of a Map of Hindustan*, (Calcutta: Indian publication, 1978), p. 147-148.

হতো এবং এখান থেকেই বিদেশী বণিকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হতো। হিজলী ও পিপলী বন্দর পর্তুগিজদের দাস ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই স্থানটি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত।

গ.

অর্থনৈতিক প্রবহমানতা

নদী বাঙলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালির চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। নদীই বাঙলাকে শ্যামল করে তুলেছে। নদীই বাঙালিকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিল ও বাঙালি বণিককে 'সাত সমুদ্দুর, তের নদী' পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করে তুলেছিল। আবার এই নদী বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার নদীই তাকে দীনহীন করে ছেড়ে দিয়েছিল। বাংলার ভাটি অঞ্চল তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

নদীর অববাহিকা মানবসভ্যতার সূতিকাগার। কৃষিই প্রাচীনতম জীবিকা আর শ্যামল-সবুজ প্রান্তরে প্রাণিসম্পদের সমারোহই জীবনায়নের স্পন্দন। মধ্যযুগে বাংলার উপকূল অঞ্চল যে এসব সত্য ও সম্ভারে সমৃদ্ধ, তা সমসাময়িক বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। ভাটি অঞ্চলের অথনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি ছিলো চাউল ও বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের উদ্বৃত্ত উৎপাদন।[২৯] স্থানীয় শাসকদের উৎসাহ সেই সমৃদ্ধিকে তরান্বিত করেছিল।

যে প্রেক্ষাপটে উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তার গতি-প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষোড়শ শতব্দীতে মোগল-আফগান যুদ্ধের ফলে ভাগীরথীর তীর বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ায় পশ্চাৎভূমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও পশ্চাৎভূমির সাথে নিবিড়তা নষ্ট হয়ে যায়। সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে সাধারণ জনগণ ও বণিকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে নিরাপত্তার তাগিদে জনগণ ভাটি অঞ্চলের দিকে বসতি স্থাপন শুরু করে।[৩০] আসলে গৌড়ের পতনের পর আর কোনো শহর পশ্চাৎভূমির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারছিল না, এর ফলে বিকেন্দ্রীভূত ছোট ছোট ভাটি শহরগুলি বিকশিত হতে থাকে। ভাটির এই শহরগুলি ছিলো

---

[২৯] রীণা ভাদুড়ী, "মধ্যযুগে বাংলার নগর বিন্যাসের ধারা (সুলতানি আমল)", অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টপাধ্যায় (সম্পা.), *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতি*, (কলিকাতা: কে. পি. বাগচী আন্ড কোম্পানি, ১৯৯২, পৃ. ৩৩।

[৩০] অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগে ভারতীয় শহর*, (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৯), পৃ. ১৩০-১৪৪।

মিশ্র প্রকৃতির এবং এগুলির উন্নয়নের হার ছিলো অসম। ভাটি অঞ্চলের জমিদারদের তৎপরতায় জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে উঠে এক নতুন নাগরিক সভ্যতা।[৩১]

মধ্যযুগে ইউরোপের মশলার চাহিদা মেটাতে গিয়ে বণিকগণ ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা সংগ্রহ করতো। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় সূতি কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩২] চতুর্দশ শতাব্দীতে চরকা ও বুনন যন্ত্রের প্রচলনের ফলে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র বয়ন সম্ভব হয়েছিল। বারবোসা বলেছেন, এদেশে চরকায় সূতো কেটে লোকজন কাপড় বুনতো।[৩৩] সোনারগাঁও, যশোর, খুলনা অঞ্চলে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হতো। পুরুষরা চরকায় সূতো কেটে কাপড় বুনত। এই কুটির শিল্পজাত দ্রব্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হতো।[৩৪] মাহুয়ান পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় গুটিপোকা ও রেশম বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

মধ্যযুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ফ্রেডারিক বারবোসা বাংলার উপকূল অঞ্চলগুলি বিশাল সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী দ্বারা পূর্ণ দেখেছিলেন যারা স্পষ্টত ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলো।[৩৫] এখানে উপকূলবর্তী গঞ্জ বা স্থানীয় বাজারগুলিতে যে লেনদেন হতো সেখানে বিদেশী বণিকদের তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। এখানে মহাজন, পোদ্দার ও ধনী বণিকদের একাধিপত্য ছিলো, যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। ভারথেমা বলেছেন, এখানকার ধনী বণিকরা তাদের সূতি ও রেশমী কাপড় শুধু ভারতের নানা প্রদেশে নয়, এমনকি তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, ইথিওপিয়াতেও রপ্তানি করতো।[৩৬] সোনারগাঁও-এর মসলিনের জগৎজোড়া খ্যাতি ছিলো। এছাড়াও এখানকার সূতিবস্ত্র ও চাউলেরও কদর ছিলো।[৩৭]

---

[৩১] রীণা ভাদুড়ী, "মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানি আমলে বাংলার নগর বিন্যাস", *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯।

[৩২] মমতাজুর রহমান তরফদার, "টোম পিরেসের বিবরণে বাংলাদেশ", *আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ১৯৬-২০৬।

[৩৩] M.L Dames (Tr.), *The book of Duarte Barbosa*, (London: Hakluyt Society, 1921), p. 148.

[৩৪] Sebastian Manrique, *Travels of Sebastian Manrique (1629-1643)*, (Lt. Col. C. Eckford tr.), (London: Hakluyt Society, 1927); উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি, ২০০০), পৃ. ৩৭-৪০।

[৩৫] M.L Dames (tr.), *op.cit.*,; উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশ বছর*, (কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল, ২০০০), পৃ. ৬২৯-৬৩১।

[৩৬] Ludovico-di-Verthema, *The Travel of Ludocico -di-Verthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and Arabia Felix, in Persia, India and Ethiopia (1503-1508 A. D.)*; cited in J. N. Dasgupta (Ed.), *Bengal in Sixteenth Century A. D.*, (Calcutta, 1914), p. 117.

[৩৭] James Wise, "Notes on Sonargaon, Eastern Bengal", *JASB*, Vol. XLIII, 1974, part-I, p. 76-82.

সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলার উপকূল অঞ্চলে খোজা দাস ব্যবসা বিস্তৃত হতে থাকে এবং পরবর্তী কালে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আরব বণিকরা বাংলার উপকূল অঞ্চল থেকে বালক দাস ক্রয় করে তাদের খোজা করার পর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিক্রি করতো। এই খোজা কৃতদাসদের হারেম ও ভূ-সম্পত্তির পাহারায় নিযুক্ত করা হতো। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে পর্তুগিজদের আবির্ভাব ঘটে এবং এরা পরবর্তীতে বাংলার ভাটি অঞ্চলে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।[৩৮] আবুল ফজলের বর্ণনা অনুযায়ী পর্তুগিজরা হুগলি ও সপ্তগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করার ফলে ভাগিরথীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। পাদরি ফারনান্দেজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মেঘনার মোহনাসহ বাংলার সামুদ্রিক উপকূল এদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বন্দুক ও কামানের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি বাঙালি বণিকদের ছিলো না। ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পদ্মপুরাণে ফিরিঙ্গিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুকে করিতে হত
> একেবারে দশবিশ ফুটে।
> কামান বন্দুক ভরি ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি
> যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছোটে।।[৩৯]

বার্নিয়ার বলেছেন, "Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small and light gallies, they did nothing but coast about that sea, and entered into all rivers there about and into the channels and arms of Ganges and between all these islands of the lower Bengal. They making women slaves great and small with strange cruelty and burning all they could not carry away."[৪০] এই পর্তুগিজ জলদস্যুরা বাংলার উপকূল অঞ্চল থেকে নির্বিচারে নরনারীকে বন্দি করে দাস হিসেবে ভারতের অন্যত্র এবং বিদেশে রপ্তানি করতো। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর ভাটি অঞ্চল একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে উপকূল অঞ্চলকে জনবসতিশূন্য করে দেয়। ১৬২১ থেকে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগিজরা বাংলার নানা স্থান থেকে ৪২,০০০ দাস ধরে চট্টগ্রামে এনেছিল। ১৬৪০ সালে মানরিখ দেখেন যে, বাংলার উপকূল এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে।[৪১]

---

[৩৮] J. J. A. Campos, *History of the Portuguese in Bengal*, (Calcutta: Butterworth and Co. Ltd., 1919), p. 28 fn.

[৩৯] বিজয় গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ*, (শ্রী জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পা.), (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), পৃ. ১৩৬।

[৪০] Francois Bernier, *Travels in Mughal Empire (1556-1568 A. D.)*, (Archibald Constable tr.), (New Delhi: S. Chand & Co., 1978), 2nd ed., p. 156-157.

[৪১] Sebastian Manrique, *op.cit*., p. 37-40.

লবণ উৎপাদন প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি দেশীয় শিল্পোদ্যোগ। 'মলঙ্গী' নামে খ্যাত চট্টগ্রামের এক শ্রেণির লোক অতীতকাল থেকে সমুদ্রের পানি জ্বাল করে লবণ উৎপাদন করতো। তাদের লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রকে 'তোফল' বলা হতো। মোগল আমলে 'নিমক জায়গীর মহাল ও নিমক এওয়াজ মহাল' নামক দুটি সরকারি বিভাগ এই শিল্প নিয়ন্ত্রণ করতো। নিজামপুর, জুলদিয়া ও বাহারছড়া এই তিনটি চাকলার অধীনে মোট ৩৯টি লবণ সংগ্রহ ক্ষেত্র ছিলো। মধ্যযুগে বাংলার ভাটি অঞ্চলের লবণের ব্যবসা বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। ডুজারিক লিখেছেন, সন্দ্বীপ থেকে সমগ্র বাংলায় লবণ সরবরাহ করা হতো। সিজার ফ্রেডরিক সন্দ্বীপকে পৃথিবীর উর্বরতম দ্বীপ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে প্রতি বছর ৩০০ জাহাজ ভর্তি লবণ রপ্তানি করা হতো।[৪২] ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান মোতাবেক সন্দ্বীপ পরগণায় বার্ষিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো ১,৩০,০০০ মণ।

মধ্যযুগে বাংলার মূল রপ্তানি পণ্য ছিলো বস্ত্র ও চাল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম , শ্রীপুর এবং পশ্চিম দিকে সাতগাঁও থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরের পথে পশ্চিমে গোয়া থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা অঞ্চল পর্যন্ত চাল রপ্তানি হতো। ষোড়শ শতাব্দীর আশির দশকে র‍্যাল্‌ফ ফিচ বাংলাকে বিশাল বস্ত্রভান্ডার বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে কাপড় ও চাল সমগ্র ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, পেগু (বার্মা), মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হতো। এ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন পিরার্ড ডি লাভাল। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রাম সফর করে তিনি লিখেছেন যে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পরও চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল গোয়া, মালাবারসহ সমগ্র ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, মালাক্কা দ্বীপসমূহে রপ্তানির অপেক্ষায় জমা (স্তূপীকৃত) আছে। মোগল শাসনামলেও এই উদ্বৃত্ত চাল রপ্তানি অব্যাহত থাকে এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ম্যানরিক লিখেছেন যে, প্রতিবছর শত শত বড় নৌকাভর্তি চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বাংলার বন্দর থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়।[৪৩]

যশোরের কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে প্রথম খেজুরের গুড় থেকে বাদামী চিনি তৈরি করা হয়। খেজুরের গুড় রাখা হতো মাটির ভাড় বা হাঁড়িতে। এরপর কপোতাক্ষ নদীতে জন্মানো এক ধরনের শৈবাল বা স্থানীয় ভাষায় 'পাটা শেওলা' দিয়ে মাটির ভাড় ঢেকে দেয়া হতো। সপ্তাহ দুই পরে মাটির ভাড়ের ওই খেজুরের গুড় পরিণত হতো বাদামী চিনিতে, যা অত্যন্ত সুস্বাদু। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো ছাড়াও বাদামী চিনি রফতানি হতো বিদেশেও।[৪৪] যশোরের খালিশপুর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, গঙ্গানন্দপুর, বোদখানা, ঝিকরগাছা, খাজুরা,

---

[৪২] Ceasar Fredericke, *op.cit*. p. 182.

[৪৩] Sebastian Manrique, *op.cit.*; উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১৪০।

[৪৪] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মোঃ রেজাউল করিম, "যশোরের খেজুর চিনি: ঔপনিবেশিক বাংলার একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপণ্য" *আইবিএস জার্নাল*, ১২শ সংখ্যা, ১৪১১ (জুলাই ২০০৫), পৃ. ২১-৪২।

রাজারহাট, রূপদিয়া, তালা, বসুন্দিয়া, ফুলতলা, কালীগঞ্জ, নোয়াপাড়া, নাভারণ, ইছাখাদা, কেশবপুর ও ত্রিমোহিনীসহ বিভিন্ন স্থানে একরকম অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনি কারখানা গড়ে ওঠে। খুলনা ও যশোর এলাকায় প্রচুর আখের চাষ হতো যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল চিনি শিল্প।[৪৫] স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত আখ থেকে যে চিনি তৈরি হতো তা ছিলো ধবধবে সাদা ও উন্নত মানের। সেলাই করা চামড়ার মোড়কে করে এগুলি মালাবার, কাম্বেসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। এসব দেশে বাংলার খেজুর চিনি চড়া দামে বিক্রি হতো।[৪৬]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্দ্বীপ এককালে কম খরচে মজবুত ও সুন্দর জাহাজ নির্মাণের জন্য পৃথিবীখ্যাত ছিলো। চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন এলাকা থেকে পর্তুগিজরা কাঠ এনে সন্দ্বীপে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ করতো। এখানে তৈরি নৌকার মধ্যে কাচারী, পাতেলা, কোষা, জেলিয়া, বালাম, বাজারে, পারিন্দা ও বজরা উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্পোস সন্দ্বীপে তৈরি জাহাজের সুখ্যাতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক অধঃপতন

নবম শতাব্দী থেকে বাংলার ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। বিভিন্ন ঘটনার পরম্পরা এর পিছনে কাজ করেছিল।

১) অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার ভাগ্যাকাশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদয় হয়। ক্রমে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। ইংরেজরা কলকাতাকে তাদের রাজধানী ও মূল বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করলে ধীরে ধীরে ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক অধঃপতন শুরু হয়।

২) ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ এক ফরমান জারি করে ঘোষণা করে যে, তাদের অনুমতি ব্যাতীত কোনো জাহাজ চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও সন্নিহিত বন্দরে নোঙর করতে পারবে না। আরব বণিকদের জব্দ করার জন্য এই ফরমান জারি করা হলেও অন্যান্য বিদেশী বণিক এই অঞ্চল থেকে মুখ ফেরায় এবং নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্র খুজে নেয়। এভাবে চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, বাকলাসহ ভাটি অঞ্চলের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।[৪৮]

৩) রাজধানী গৌড়ের পতনের সাথে সাথে চট্টগ্রামসহ ভাটি অঞ্চলের অর্থনীতির ও অধঃপতন শুরু হয়। পর্তুগিজরা তাদের ব্যবসা কেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে হুগলি ও চন্দননগরে

---

[৪৫] এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪৪।

[৪৬] Ibn Battuta, *op.cit*., p. 235.

[৪৭] J.J.A. Campos, *op.cit*., p. 119.

[৪৮] Prof Ranabir Chakrabarti of Jawaharlal Nehru University, New Delhi delivers a lecture at the inaugural session of the two-day long conference on "Heritage Chatigram History Conference", the Daily Star-Abdul Karim Sahityavisharad first memorial Lecture on "Chattagram and the Bay of Bengal Network: A Maritime Profile c 500 -1500 CE ", 16 march, 2012.

স্থানান্তরিত করে। এভাবে উত্তর-পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি হলে ভাটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক নিদারুণ চালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।[৪৯]

৪) মোগল-আফগান ও আরাকানি মগদের ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে ভাটি অঞ্চলের সামাজিক জনজীবন ক্রমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[৫০] উত্তর-পূর্ব বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ঘন জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ভাটি অঞ্চলের অর্থনীতিকে ক্রমশ পঙ্গু করে দেয়।

৫) পর্তুগিজরা বণিক হিসেবে বাঙলায় এলেও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে তারা জলদস্যুতায় নেমে পড়ে। এক্ষেত্রে আরাকান রাজা মোগলদের বিরুদ্ধে পর্তুগিজদের লেলিয়ে দিয়েছিল। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা ভাটি অঞ্চলে নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠন শুরু করে। শিহাব উদ্দিন তালিশের বর্ণনায় জানা যায় যে, পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এবং ভাটি অঞ্চল থেকে নির্বিচারে জনগণকে বন্দি করে ধরে এনে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করতো। তারা এভাবে দাস ব্যবসাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে। মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের ক্রমাগত অত্যাচারে জনবহুল ভাটি অঞ্চল বিরান হয়ে যায়।[৫১]

পরিশেষে বলা যায় যে, মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি সমগ্র মধ্য যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আর বাংলার এই মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতির মূলে ছিলো তার বৈদেশিক বাণিজ্য। তবে শিল্প উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বাঙালি বণিকদের নিয়ন্ত্রণ না থাকা। ব্যাণিজ্যিক সংঘের অভাব, উন্নত প্রযুক্তির অনুপস্থিতি, নিম্নমানের ব্যাণিজ্যিক নীতিবোধ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় ও পশ্চিম এশীয় বণিকদের সাথে বাঙালি বণিকেরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছিল না। এই অবস্থায় তারা অপ্রধান সহযোগী হিসেবেই বোধহয় ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছিল। সমুদ্র পথে যাত্রা ও অহিন্দুদের সাথে মেলামেশা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাধা হিন্দু বণিকদের বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। বর্ণ প্রথাই বাণিজ্য নির্ভর হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভবের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি শাসককূলের অনিহার ফলে স্থায়ী ভিত্তিতে বাণিজ্যিক পুঁজি গঠন সম্ভবপর হয় নি। এর ফলে চতুর্দশ শতব্দীতে বাংলায় বিভিন্ন বন্দর শহরের উদ্ভব ও বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটলেও কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক নির্ভরতার কোনো তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি।

---

[৪৯] Reena Bhaduri, *Social Formation in Medieval Bengal*, (Kolkata: Bibhasa, 2001), p.219.

[৫০] Jadunath Sarkar, "The conquest of Chatgaon, 1666 A.D.", *JASB.*, Numismatic Supplement - 3, Vol. VI, Calcutta, 1907, p.406.

[৫১] J. N. Sarkar, "Firingis Pirates of Chittagong", *JASB*, Vol. III, No. 6, pp. 71-73.